বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিনির্মাণে আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির বিলোপ দরকার

১৯৭১-এ নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি-আদিবাসী, ধনী-গরিব সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে। গত প্রায় ৫০ বছরে অর্থনৈতিক খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিপুল উন্নয়ন সাধন করেছে। কিন্তু বেদনাকরভাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশটি এখনো সমানভাবে সবার হয়ে ওঠে নি। মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল বৈষম্যহীনতা। সেই ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান তার নাগরিকদের প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য না করার অঙ্গীকার করলেও বৈষম্যমুক্ত একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা মানুষে-মানুষে সমান মর্যাদা আমরা এখনো নিশ্চিত করতে পারি নি।

১৯৭২-এর সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করলেও এখনো পর্যন্ত সর্বত্র আধিপত্যবাদী সংস্কৃতিরই ক্রমবিকাশ ঘটে চলেছে, যা বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। কাজেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সব ধরনের আধিপত্যবাদ, বিশেষ করে লিঙ্গীয়, ধর্মীয় ও জাতিগত আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামাই আগামীর সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের পূর্বশর্ত হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘদিনের চর্চার ফলে আধিপত্যবাদী এই সাংস্কৃতিক বোধ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই কম-বেশি গেঁড়ে বসেছে; যে কারণে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য, ধর্মীয় সংখ্যাল্প জনগোষ্ঠীর ওপর সংখ্যাগুরুর আধিপত্য, আদিবাসীদের ওপর বাঙালির আধিপত্য এখানে বড়ো কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়ছে না। দিন দিন এই প্রবণতা বাড়তে থাকায় সিংহভাগ মানুষ আজ একে অনেকটা স্বাভাবিক বলেই গণ্য করছে।

লিঙ্গীয় আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে নারী নানা বৈষম্য ও অবদমনের শিকার। সংবিধানের সমতার নীতি উপেক্ষা করে ধর্মের নামে চাপানো আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি এই অবস্থাকে আরো জোরদার করে চলেছে নানা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে ও নারীবিদ্বেষী প্রচারণা চালিয়ে। ফলে নারীর প্রতি একের পর এক সহিংসতার ঘটনা ঘটে চললেও মানুষ তার পাশে না দাঁড়িয়ে উলটো তার পোশাক, চলাফেরা, আচরণ ইত্যাদির দিকে আঙুল তুলছে ও সহিংসতার ঘটনাকে বৈধতা দিচ্ছে। দুঃখজনকভাবে আমাদের আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতিও এসবের বিলোপ সাধনে যত্নবান না হয়ে ৭৫-এর পর থেকে ক্রমশ এর পরিসর তৈরি করে দিয়েছে ও এখনো দিচ্ছে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের মধ্যে ধর্মকে সম্পৃক্তকরণ, এ সংক্রান্ত সহায়ক আইন প্রণয়ন ইত্যাদি নারীবিরোধী ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে নানাভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার কিছু উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

যাঁরা নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসেন, সরকার গঠন করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হন– সংবিধানকে সমুন্নত রেখে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে সমানভাবে মনোযোগী হওয়া তাঁদের দায়িত্ব। সেজন্য সমাজ-রাষ্ট্রে প্রচলিত বৈষম্য ও বঞ্চনার সংস্কৃতি বিলোপ এবং আধিপত্যবাদী রাজনীতির চর্চায় পরিবর্তন আনা জরুরি। এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি হতে পারে মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের সমমর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের উপযোগী ব্যবস্থা, যেমন খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মতো ইহজাগতিক প্রয়োজন মেটানোয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুসজ্জিত করা। ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়, যার দেখভাল করবেন ব্যক্তি নিজে এবং ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী স্ব স্ব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা পরজগতে এ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, রাষ্ট্রের এ বাবদে কোনো দায়দায়িত্ব নেই।

এই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে নারী, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যাল্প জনগোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংবিধান প্রদত্ত সমান সুযোগ ও মর্যাদা ভোগ করতে দেওয়ার পথটি প্রশস্ত হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন একটি সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন ক্রমে বাস্তবে রূপায়িত হবে।